প্রথম অধ্যায়

সামষ্টিক অর্থনৈতিক গতিধারা

প্রবৃদ্ধি

রাজনৈতিক অস্থিরতাসহ নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ২০০৩-০৪ অর্থবছরে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় এবং মানব উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করে। সামষ্টিক অর্থনীতির বিভিন্ন নির্দেশক অনুযায়ী বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির ঊর্ধ্বমুখী ধারা অব্যাহত রয়েছে। মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ২০০১-০২ অর্থবছরে যেখানে ছিল ৪.৪ শতাংশ ২০০২- ০৩ অর্থবছরে তা ৫.২৬ শতাংশে উন্নীত হয়। বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের এ ধারা চলতি অর্থবছরেও অব্যাহত থাকে।বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০০৩-০৪ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে ৫.৫২ শতাংশে। এই প্রথমবারের মত বাংলাদেশে মাথাপিছু জিডিপি এবং জাতীয় আয় যুগপৎ ৪০০ মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। চলতি অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি ও জাতীয় আয় যথাক্রমে ৪২১ ও ৪৪৪ মার্কিন ডলার। উল্লেখ্য যে, ২০০৩-০৪ অর্থবছরে প্রক্ষেপিত জিডিপি ২০০২-০৩ অর্থবছরের তুলনায় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বেড়েছে। ব্যুরোর তথ্যমতে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প মিলিয়ে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে ৭.৪১ শতাংশে যেখানে ২০০২-০৩ অর্থবছরে এখাতে প্রবৃদ্ধি ছিল ৬.৭৫ শতাংশ। অন্যদিকে সেবা খাতেও প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে ৫.৩৮ শতাংশ। শিল্প, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং সেবা খাতের অবদান ছাড়াও সার্বিক প্রবৃদ্ধির এই উচ্চ হার অর্জনের পেছনে রয়েছে অভ্যন্তরীণ চাহিদার ঊর্ধ্বমুখিতা।

প্রবৃদ্ধি অর্জনের চলমান এ গতিধারার পাশাপাশি বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সুপেয় পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণসহ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জেন্ডার-বৈষম্য দূর করার মাধ্যমে জাতিসংঘ ঘোষিত Millennium Development Goals-এর দু'টি লক্ষ্য অর্জন করেছে। অন্যদিকে শিশুমৃত্যু, মাতৃমৃত্যু এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নেও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্রমোন্নতির ধারা অব্যহত থাকলে বাংলাদেশ দ্রুত দারিদ্র্য নিরসন এবং মানব উন্নয়নসহ কাঙ্খিত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হবে।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র সাময়িক প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০০৩-০৪ অর্থবছরে জাতীয় সঞ্চয় জিডিপি'র ২৪.৪৯ শতাংশ এবং জাতীয় বিনিয়োগ এযাবৎ কালের সর্বোচ্চ ২৩.৫৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। জাতীয় বিনিয়োগে সরকারি ও বেসরকারি খাতের অবদান যথাক্রমে ৬.১২ শতাংশ এবং ১৭.৪৭ শতাংশ হবে বলে অনুমিত হচ্ছে।

রাজস্ব খাতের গতিধারা

বর্তমান সরকার কর্তৃক সুবিবেচনা প্রসূত রাজস্বনীতি গ্রহণ ও অনুসরণের ফলে বাংলাদেশে রাজস্বখাতে শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। এর ফলে ২০০২-০৩ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি ২০০১-০২ অর্থবছরের জিডিপি'র ৪.৭ শতাংশ থেকে ৩.৫ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরের বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র শতকরা ৪.২ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে। প্রাথমিক প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০০৩-০৪ অর্থবছরের চলতি ব্যয় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে রয়েছে। মার্চ ২০০৪ পর্যন্ত এ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় ৮,০০০ কোটি টাকা যা গত অর্থবছরের একই সময়ের উন্নয়ন ব্যয়ের তুলনায় ৪ শতাংশ বেশি। ২০০০-০১ অর্থবছরে যেখানে সরকারের অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ ছিল জিডিপি'র ৩ শতাংশ সেখানে ২০০২-০৩ অর্থবছরে তা দাঁড়িয়েছে ১.৩ শতাংশে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ ঋণ জিডিপির নির্ধারিত ১.৮ শতাংশেই সীমাবদ্ধ থাকবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, রেয়াতি বৈদেশিক অর্থায়ন (concessional foreign financing) ২০০০-০১ অর্থবছরে জিডিপির ২ শতাংশ থেকে ২০০২-০৩ অর্থবছরে প্রায় ৩ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০০২-০৩

অর্থবছরে রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ১০.৩ শতাংশে উন্নীত হয়। মধ্যমেয়াদে এ অনুপাত জিডিপির অন্তত ০.৫ শতাংশ হারে বাড়িয়ে ১২ শতাংশে উন্নীত করা হবে। এ উদ্দেশ্যে কর কাঠামো সংস্কারের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি ব্যয় জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধির পরিকল্পনাও সরকারের রয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের রাজস্ব-জিডিপি এবং ব্যয়-জিডিপি অনুপাত উন্নয়নশীল দেশের মাপকাঠিতেও নিম্নে রয়েছে।

কাঠামোগত সমন্বয়ের প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাসমূহের লোকসান ২০০০-০১ অর্থবছরে জিডিপি'র ১ শতাংশ থেকে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ০.৪ শতাংশে হ্রাস করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে কৃষি এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য ভর্তুকির পরিমাণ ৩০০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০০২-০৩ অর্থবছরে এই ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ২০০ কোটি টাকা। একই সাথে কৃষি এবং কৃষিভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করার জন্য এখাতে সুদের হার ৯-১০ শতাংশে কমিয়ে আনা হয়েছে। তবে কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহ বাংলা নববর্ষ ১৪১১ (১৪ এপ্রিল) ২০০৪ থেকে সকল প্রকার কৃষি ঋণের সুদের হার ৮ শতাংশে নামিয়ে এনেছে।

দারিদ্র নিরসনমুখী প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য ২০০২-০৩ অর্থবছরে দারিদ্র নিরসনের ক্ষেত্রে ব্যয় বাজেটের শতকরা ৪২ শতাংশে (জিডিপির ৬.৩ শতাংশ) উন্নীত করা হয়। চলতি অর্থবছরে এ বরাদ্দ আরও উন্নীত করে ৪৭.৪ শতাংশে (জিডিপির শতকার ৭.৫ শতাংশ) স্থির করা হয়েছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক খাত

নব্বই-এর দশকের প্রথমার্ধে বাণিজ্য উদারীকরণের লক্ষ্যে যে সংস্কার প্রক্রিয়া সূচিত হয়েছিল বিগত সরকারের আমলে তা স্থবির হয়ে পড়ায় বৈদেশিক বাণিজ্যে তার সুস্পষ্ট নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান সরকার বাণিজ্য উদারীকরণ সংস্কার (trade liberalisation reforms) প্রক্রিয়াকে পুনরুজ্জীবিত করে আরও বেগবান করেছে। ফলে দেশের রপ্তানি বাণিজ্য ২০০১-০২ অর্থবছরের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির অবস্থা থেকে ফিরে দাঁড়িয়ে ২০০২-০৩ অর্থবছরে ৯.৩৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। চলতি অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত রপ্তানি বাণিজ্যে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ১৪.৮ শতাংশ। আমদানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও উল্লেখ্যযোগ্য প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। জুলাই ২০০৩ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০০৪ পর্যন্ত এ প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ১৮.০ শতাংশ, যা বিনিয়োগ ও ভোগসহ অভ্যন্তরীণ কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধির প্রবণতাকে প্রতিফলিত করে।

প্রবাসীদের রেমিট্যান্স প্রেরণের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে গত দুই অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যায়। ২০০১-০২ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহ ৩৩ শতাংশ এবং ২০০২-০৩ অর্থবছরে ২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। চলতি অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের রেমিট্যান্স প্রবাহের তুলনায় ১১.৪ শতাংশ রেমিট্যান্স বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে রেমিট্যান্স প্রায় ৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হবে।

২০০০-০১ অর্থবছরে যেখানে চলতি হিসাবে ১,০১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি ছিল ২০০১-০২ অর্থবছরে তা কাটিয়ে ২৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০০২-০৩ অর্থবছরে ৫৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত অর্জন করা সম্ভব হয়। চলতি অর্থবছরে বহির্বাণিজ্যের ভারসাম্যের সার্বিক পরিস্থিতি সন্তোষজনক এবং উত্তরোত্তর এ পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে এবং ফেব্রুয়ারি ২০০৪ পর্যন্ত চলতি হিসেবে ৬২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত অর্জিত হয়েছে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিস্থিতির লক্ষ্যণীয় উন্নতি হয়েছে এবং মে ২০০৪ পর্যন্ত রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ৩.৫ মাসের আমদানি ব্যয় পরিশোধের জন্য যথেষ্ট। স্মর্তব্য, ২০০০-০১ অর্থবছরে এই রিজার্ভের পরিমাণ ছিল মাত্র ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ব্যক্তিখাতে ঋণ প্রদানের গতিধারা এবং সুদের হার

২০০৩-০৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ব্যক্তিখাতে প্রদত্ত ঋণ গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১২.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত বিতরণকৃত কৃষিঋণ গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১১.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে শিল্প মেয়াদি ঋণ বিতরণের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে (ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণসহ) এ অর্থবছরে মার্চ ২০০৪ পর্যন্ত সময়ে শিল্প মেয়াদি ঋণ বিতরণের (Industrial Term Loan) পরিমাণ গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ৭৬.৭ শতাংশ বেশি যা শিল্প খাতের অনন্য গতিশীলতাকে নির্দেশ করে। উল্লেখ্য ২০০৩-০৪ অর্থবছরে নয় মাসের বিতরণকৃত ঋণ ২০০২-০৩ অর্থবছরে মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণকে ৮০৩ কোটি টাকায় ছাড়িয়ে গেছে। ঋণ প্রবাহের এই অনুকূল প্রবণতা সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক সুদের হার হ্রাস করারও ফলশ্রুতি। লক্ষ্যণীয় যে, ৯১ দিনের ট্রেজারি বিলের সুদের হার জুন ২০০৩-এর ৮.৮ শতাংশ থেকে মার্চ ২০০৪-এ ৪ শতাংশে এবং ৩৬৪ দিনের ট্রেজারি বিলের সুদের হার ৯.৯ শতাংশ থেকে ৬.৪ শতাংশে হ্রাস পায়।

মূল্যস্ফীতি ও মুদ্রানীতি

প্রধানত উচ্চ আমদানি মূল্যের প্রভাবে খাদ্য মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০০৩ সনে ১২ মাসের পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট এবং গড় ভোক্তা মূল্য সূচক অনুযায়ী মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তবে ডিসেম্বর ২০০৩-এ, এ প্রবণতা কিঞ্চিৎ হ্রাস পায় এবং জানুয়ারি ২০০৪-এ আরও নেমে আসে। ১২ মাসের পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি জুন ২০০৩-এর ৫ শতাংশ থেকে নভেম্বর ২০০৩-এ ৬.৭ শতাংশে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ডিসেম্বর ২০০৩-এ তা ৬.৫ শতাংশে এবং ফেব্রুয়ারী ২০০৪-এ ৫.৮ শতাংশে নেমে আসে। খাদ্য মূল্যস্ফীতি যা ফেব্রুয়ারী ২০০৪-এ ৭.০৮ শতাংশ ছিল তা পরবর্তী দু'মাসে হ্রাস পায়। খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ধীরে ধীরে কমে আসায় ফেব্রুয়ারী ২০০৪-এ তা ৪.০৫ শতাংশে নেমে আসে। বোরো ফসল লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ফলন হলে খাদ্য মূল্য আরও হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সরকারি ঋণের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা কম হওয়ার কারণে মুদ্রানীতি মোটের উপর ব্যক্তিখাতের ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির বিষয়ে সংকুলানমুখী (accommodative) থাকে। জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৩ পর্যন্ত সময়ে ট্রেজারি বিলের সুদের হারের ভারিত গড় (weighted average) প্রায় ৩ শতাংশ হ্রাস পায়।

চলতি অর্থবছরে টাকা-ডলার বিনিময় হার স্থিতিশীল থাকলেও প্রধান প্রধান কারেন্সির বিপরীতে প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার কিছুটা হ্রাস পায় যা রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়ে উঠে। ডিসেম্বরের শুরুর দিকে এলসি খোলার জন্য মার্জিন রাখার বাধ্যবাধকতা ক্রমান্বয়ে তুলে নেয়ার ফলে বিনিময় বাধানিষেধ দূর হয় এবং এতে আমদানি ব্যয় হ্রাস পায়।

সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি

মধ্যমেয়াদি সামাষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র নিরসন এবং সামাজিক উন্নয়নের জাতীয় কৌশলপত্র (IPRSP) এবং আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF)-এর সাথে পিআরজিএফ (Poverty Reduction and Growth Facility) কর্মসূচির আওতায় অর্থনীতিতে যে সব সংস্কার আনা প্রয়োজন তা বাস্তবায়নে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জাতীয় দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্র বাস্তবায়নের সুবিধার্থে সরকার জুন ২০০৩-এ একটি মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো গ্রহণ করেছে। এ কাঠামোর আওতায় ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিষয়টি সরকার অব্যাহতভাবে অনুসরণ করছে। চলতি অর্থবছরে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সরকার যে সাফল্য অর্জন করেছে তা মধ্যমেয়াদি অর্থনৈতিক কাঠামোর আওতায় সূচিত সংস্কার কার্যক্রমেরই ফল।

সারণি ১.১ ঃ প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক সূচক সমূহ এবং মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (এমটিএমএফ)

	অর্থবছর ০১ (প্রকৃত)	অর্থবছর ০২ (প্রকৃত)	অর্থবছর ০৩ (প্রকৃত)	প্রোগ্রাম		প্রোগ্রাম	সংশোধিত বাজেট প্রক্ষেপণ		
				বাজেট অর্থবছর ০৪	সংশোধিত বাজেট অর্থবছর ০৪	বাজেট অর্থবছর ০৫	অর্থবছর ০৬	অর্থবছর ০৭	অর্থবছর ০৮
জাতীয় আয় এবং মূল্য (শতকরা পরিবর্তন)									
স্থিরমূল্যে জিডিপি	৫.৩	৪.৪	৫.৩	৫.৫	৫.৫	৬.০	৬.৫	৬.৮	৭.০
জিডিপি ডিফ্লেটর	১.৬	২.৭	৪.৪	৪.০	৪.৯	৫.০	৪.৫	৪.০	৪.০
সিপিআই মূল্যস্ফীতি (গড়)	১.৯	২.৮	৪.৪	৪.৫	৬.০	৫.৫	৫.০	৪.৫	৪.০
চলতি বাজার মূল্যে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার	৭.০	৭.২	১০.০	৯.৭	১০.৬	১১.৩	১১.৩	১১.১	১১.৩
চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি (বিলিয়ন টাকা)	২৫৩৫.৫	২৭৩২.০	৩০০৫.৮	৩২৯৪.১	৩৩২৫.৭	৩৭০১.৫	৪১১৯.৫	৪৫৭৫.৬	৫০৯০.৭
চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি (বিলিয়ন ইউএস ডলার)	৪৪.৫	৪৭.৬	৫১.৯	৫৫.১	৫৫.৪	৫৮.৫	৬২.০	৬৫.৯	৭০.৫
রাজস্ব খাত (জিডিপির শতাংশ হিসেবে)									
মোট রাজস্ব	৯.০	১০.২	১০.৩	১১.০	১০.৭	১১.২	১১.৫	১১.৮	১২.০
মোট ব্যয়	১৪.৮	১৪.৮	১৩.৯	১৫.৮	১৪.৯	১৫.৫	১৫.৮	১৬.১	১৬.২
সার্বিক ভারসাম্য	**-৫.১**	**-৪.৭**	**-৩.৫**	**-৪.৮**	**-৪.২**	**-৪.৩**	**-৪.৩**	**-৪.৩**	**-৪.২**
প্রাথমিক ভারসাম্য	-৩.৫	-২.৯	-১.৭	০.০	-২.৫	-২.৪	-২.৩	-২.৩	-২.২
অর্থায়ন (নীট)	**৫.১**	**৪.৭**	**৩.৫**	**৪.৮**	**৪.২**	**৪.৩**	**৪.৩**	**৪.৩**	**৪.২**
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন ঃ	৩.১	২.৬	১.৩	১.৭	২.৩	১.৯	১.৯	১.৯	১.৯
ব্যাংক ব্যবস্থার অধীনে	-	০.৮	-০.৪	০.৬	০.৯	০.৮	০.৮	০.৮	০.৮
ব্যাংক বহির্ভূত	-	১.৭	১.৬	১.১	১.৪	১.১	১.১	১.১	১.১
বৈদেশিক অর্থায়ন	২.০	২.১	২.২	৩.১	১.৯	২.৪	২.৪	২.৪	২.৩
মুদ্রা ও ঋণ (বছর শেষে ; শতকরা পরিবর্তন)									
বেসরকারিখাত	২৪.২	১৩.৯	১২.৭	১৪.১	১২.০	১৪.০	১৪.৫	১৫.০	১৫.০
ব্যাপক মুদ্রা (এম ২)	১৬.৮	১৩.১	১৫.৬	১৩.৮	১৩.১	১২.৬	১৩.০	১৩.০	১৩.৫
লেন-দেনের ভারসাম্য (শতকরা পরিবর্তন)									
রপ্তানি, এফ ও বি	১১.৪	-৭.৬	৯.৫	৭.২	১৩.৩	৯.০	১০.০	১০.৫	১১.০
আমদানি, এফ ও বি	১১.৪	-৮.৭	১৩.০	১০.১	১৫.২	৮.৫	৯.০	৯.৫	১০.০
রেমিট্যান্স	৪.০	৫.৩	২২.৪	৭.৫	৭.৮	৭.৫	৭.৫	৭.০	৬.৫
গ্রস অফিসিয়াল রিজার্ভ (মিলিয়ন ইউএস ডলার);	**১৩০৬.৭**	**১৫৮২.৭**	**২৪৭০.০**	**২৮৪৮.০**	**২৮৭০.০**	**৩৩১২.০**	**৩২২৫.০**	**৩৮৫০.০**	**৪০০০.০**
রিজার্ভ দ্বারা যত মাসের আমদানি ব্যয় মিটানো যায়	১.৭	১.৮	২.৯	২.৯	২.৯	২.৯	২.৯	২.৯	২.৯

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয় ও বিবিএস।

নোটঃ সারণিতে উপস্থাপিত উপাত্তসমূহ সাময়িক। চূড়ান্ত পিআরএসপি-এর ভিত্তিতে উপাত্তসমূহ পরিবর্তিত হতে পারে।

মধ্যমেয়াদি অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি মধ্যমেয়াদি ব্যয় কাঠামো ও (medium term expenditure framework) তৈরি করা হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হল ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি)-কে বার্ষিক বাজেট প্রক্রিয়ার সাথে সূত্রবদ্ধ করা। প্রস্তাবিত কাঠামোর আওতায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সমূহ নির্ধারিত resource envelope -এর আওতায় নিজ নিজ বাজেট প্রণয়ন করবে। এ উদ্দেশ্যে কৃষি, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সমূহে চারটি ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (FMU) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অন্যান্য প্রধান মন্ত্রণালয়সমূহেও এধরনের ইউনিট প্রতিষ্ঠার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

রাজস্ব খাতে সংস্কার কার্যক্রম

- সরকারি ব্যয়ের গুণগতমান ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং রাজস্ব সংগ্রহ প্রয়াস জোরদারকরণের লক্ষ্যে সরকার দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণের পর অনতিবিলম্বে সরকারি ব্যয় পর্যালোচনা কমিশন এবং রাজস্ব সংস্কার কমিশন নামে দুটো কমিশন গঠন করে। কমিশনদ্বয় কর্মমেয়াদ শেষে তাঁদের সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করেছেন। সরকার বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশসমূহ শীঘ্রই বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। উল্লেখ্য, ২০০৩-০৪ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নের সময় কমিশনদ্বয়ের অন্তবর্তীকালীন সুপারিশসমূহ বিবেচনায় আনা হয়।

- কর প্রশাসনকে জোরদার করার জন্য বন্ডেড ওয়্যারহাউজ পদ্ধতিকে পুনরুজ্জীবিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া Large Tax Payer Unit সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণসহ কর ফাঁকি রোধে অচিরেই Central Intelligence Unit -ও প্রতিষ্ঠা করা হবে।

- দারিদ্র নিরসন এবং জেন্ডার সংযোজনশীল ব্যয়ের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক উপাত্তের জন্য একটি আরসিজিপি (recurrent, capital, gender and poverty) ব্যয় মডেল তৈরি করে বাজেটের তথ্য ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবায় সরকারি ব্যয়ের প্রভাব কি তা চিহ্নিত করার জন্য তিনটি tracking study পরিচালিত হয়েছে।

- গতানুগতিক বাজেট পরীক্ষণের সীমাবদ্ধ গন্ডি থেকে বেরিয়ে অধিকতর বিশ্লেষণমুখী কাজে নিবিষ্ট হওয়ার জন্য অর্থ বিভাগে একটি Microeconomic Policy Analysis Unit স্থাপন করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট রিফর্ম প্রোগ্রাম (এফএমআরপি) প্রকল্পের আওতায় ইউনিটটি আরও জোরদার করার প্রয়াস অব্যাহত হয়েছে। পাশাপাশি অর্থ বিভাগের সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনার সামর্থ্য (capacity) বৃদ্ধির জন্য একটি পৃথক ইউনিট প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে চলেছে। ইতোমধ্যে এ ইউনিটের দায়িত্ব পালনের উপযোগী কর্মকর্তা নির্বাচন করে তাঁদের নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ব্যাংকিংখাত সংস্কার

- ***সরকারের ব্যাংকিং খাত উন্নয়নের কৌশলে*** financial deepening এবং আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট এবং বাজার বিকাশের মাধ্যমে সঞ্চয় সমাবেশ এবং বন্টনের (mobilisation and allocation) উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একই সাথে স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ (এসএমই) অর্থায়ন এবং ক্ষুদ্রঋণ সম্প্রসারণের মাধ্যমে দরিদ্র জনসাধারণের প্রবেশগম্যতা (access) সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

- ***রাষ্ট্রায়াত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সংস্কারঃ*** চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে সরকার রূপালী ব্যাংক ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর করেছে এবং অবশিষ্ট তিনটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছে।

- গত অর্থবছরের মার্চ মাসে জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ ব্যাংক আইন, ১৯৭২, বাংলাদেশ ব্যাংক (জাতীয়করণ) আদেশ, ১৯৭২ এবং ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এ সংশোধনীসমূহ পাশ করা হয়। এ সব সংশোধনীর ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বশাসন (autonomy) ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা (regulatory power) সম্প্রসারিত হবে, সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের গভর্ণ্যান্স উন্নত হবে এবং আইনগত কাঠামোর (legal framework) ত্রুটিসমূহ দূর হবে। জাতীয়করণকৃত ব্যাংকসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি নিয়ন্ত্রণের (supervisory control) আওতায় আনা হয়েছে।

- ***আর্থিক বাজারের উন্নয়নঃ*** বাংলাদেশ ব্যাংক সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সহায়তায় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আর্থিক বাজার বিকাশের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে অন্যান্যের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বন্ড মার্কেটের বিকাশ এবং আন্ত-ব্যাংক অর্থ বাজারের দক্ষতা উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। এর প্রধান লক্ষসমূহ হলঃ আর্থিক মধ্যস্থতাকরণের (intermediation) উন্নয়ন, ঝুঁকি বৈচিত্র্যকরণের (risk diversification) সুযোগ প্রদান এবং বিনিয়োগের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ সমাবেশে সহায়তা প্রদান এবং সুদের হারের উপর চাপ হ্রাস।

- ***ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের (এসএমই) অর্থায়নঃ*** পল্লী ও শহর অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে, মানব উন্নয়ন ও দারিদ্র নিরসনে, রপ্তানি প্রসারে, ব্যক্তিখাতকে উদ্বুদ্ধকরণে এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নে এসএমই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। একারণে এসএমই সেক্টর সরকারের সার্বিক উন্নয়ন কৌশলের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান করে নিয়েছে। এসএমই বিকাশের ক্ষেত্রে মূল সমস্যা এসব প্রতিষ্ঠানের ঋণে নগণ্য প্রবেশাধিকার এবং অর্থায়নের উচ্চ ব্যয়। বেসরকারি ব্যাংকসমূহ সাধারণত এসএমই সেক্টরে ঋণ সম্প্রসারণে অনিচ্ছুক। এর প্রধান কারণ হল উচ্চ ঝুঁকি এবং তদারকি ব্যয়। এসএমই সেক্টরে ঋণ সুবিধা প্রদানের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং এ ক্ষেত্রে ঝুঁকির মাত্রাকে হ্রাস করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এর বিদ্যমান রিফিন্যান্স উইন্ডো (refinance window)-কে স্মল এন্টারপ্রাইজ তহবিলে রূপান্তরিত করেছে।

মুদ্রা ও বিনিময় হার ব্যবস্থা

মুদ্রা বাজারে স্থিতিশীলতা এবং এক্ষেত্রে যথাযথ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা ও বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা এবং ব্যাংক তদারকির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা নিম্নরূপঃ

মুদ্রা ও বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা

- ব্যাংক রেট ৬ নভেম্বর ২০০১ তারিখে ৬ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে কমিয়ে আনা হয় এবং তারপর অপরিবর্তিত থাকে। অন্যদিকে, ৮ নভেম্বর ২০০৩ তারিখে নগদ রিজার্ভ হার (CRR)-কে ৪ শতাংশে অপরিবর্তিত রেখে তফসিলি ব্যাংক সমূহের বিধিবদ্ধ তরল সম্পদ সংরক্ষণের হার (SLR) ২০ শতাংশ থেকে ১৬ শতাংশে হ্রাস করা হয়। স্ব-স্ব ব্যাংক এবং মুদ্রা বাজারে উন্নততর তারল্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে পুনঃক্রয় চুক্তি এবং বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি (Repo এবং Reverse Repo auction) নিলাম ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। মুদ্রাবাজারে স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য জুলাই ২০০৩ থেকে আন্তঃব্যাংক পুনঃক্রয় চুক্তি প্রবর্তন করা হয়েছে।
- ২৯ ডিসেম্বর ২০০৩ থেকে অর্ধ-বার্ষিক সুদের কুপনসহ ৫ বছর ও ১০ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড প্রবর্তন করা হয়-যা সরকারের ঋণ ও মুদ্রানীতি ব্যবস্থাপনার অনুষঙ্গী ইন্সট্রুমেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
- ১০ জানুয়ারি ২০০৪ থেকে সব ধরণের পণ্যের জন্য প্রদত্ত রপ্তানি ঋণের সুদের হার শতকরা ৭ ভাগ স্থির করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক সফলতার সাথে ভাসমান বিনিময় হার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে এবং এ ক্ষেত্রে অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয়নি।
- ধান, গম ও চিনি আমদানির জন্য লেটার অব ক্রেডিট খোলার জন্য শতকরা ১০০ ভাগ মার্জিনের যে বাধ্যবাধকতা ছিল তা পরবর্তী পর্যায়ে শিথিল করে ধান ও গমের জন্য শতকরা ২৫ ভাগ স্থির করা হয়।
- সাম্প্রতিক সময়ে বলবৎ অর্থঋণ আদালত আইন ইতোমধ্যে non-performing ঋণ আদায়ে কার্যকারিতা প্রমাণ করেছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন পর্যালোচনা করে একে আরও কার্যকর করার জন্য অতিশীঘ্রই প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হচ্ছে।

ব্যাংক তদারকি

- ব্যাংক সমূহের ন্যূনতম মূলধন তাদের মোট ঝুঁকি-ভারিত পরিসম্পদের (risk weighted asset) শতকরা ৮ ভাগ থেকে ৯ ভাগে উন্নীত করা হয়েছে। অন্যদিকে মুখ্য মূলধন (core capital) শতকরা ৪ থেকে ৪.৫ ভাগে উন্নীত করা হয়েছে।
- ব্যাংকের ক্ষেত্রে মূলধনের শতকরা ১৫ ভাগের অধিক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা বিলোপ করে তদস্থলে মোট মূলধনের শতকরা ৫০ ভাগ single borrower exposure ceiling-সহ নির্ধারিত সুবিবেচনাপ্রসূত নির্দেশমালা (prudential guidelines) অনুসরণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।
- ক্ষতি হিসেবে শ্রেণীকৃত ঋণ অবলোপনের বিষয়ে ব্যাংকসমূহকে উৎসাহিত করার জন্য নতুন নির্দেশমালা জারি করা হয়েছে। এ জন্য ব্যাংকগুলো চলতি আয়ের বিপরীতে পূর্ণ সঞ্চিতি রাখতে পারবে। নতুন নির্দেশ মালায় ঋণ আদায়ের জন্য গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের বিধান রাখা হয়েছে।
- বড় অঙ্কের ঋণ (৫০ কোটি কিংবা তদূর্ধ্বের) পুনঃ তফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহকে দরকষাকষিতে (collective bargain) উৎসাহিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশমালা জারি করেছে। এতে ঋণদানকারী ব্যাংকসমসূহের সম্মিলিত দরকষাকষির অবস্থান (collective bargaining position) আরও জোরদার হবে।
- নতুন ঋণ পুনঃ তফসিলিকরণের নির্দেশমালা কঠোর করা হয়েছে যাতে ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানসমূহ অনুচিত সুবিধা গ্রহণ করতে না পারে।

অর্থনৈতিক খাত পর্যালোচনা

নিম্নের অনুচ্ছেদসমূহে অর্থনীতির খাতভিত্তিক পর্যালোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হলঃ

কৃষি

দেশের আর্থ-সামাজিক ও টেকসই উন্নয়নে কৃষিখাতের ভূমিকা ব্যাপক। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির সমন্বিত অবদান উল্লেখযোগ্য। ২০০৩-০৪ অর্থবছরের জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান শতকরা ২২.৮৩ ভাগ। ২০০২-০৩ অর্থবছরে খাদ্য শস্যের প্রকৃত উৎপাদন ছিল ২৬৭ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে খাদ্য শস্যের উৎপাদন লক্ষ্য মাত্রা ধরা হয়েছে ২৮১.২ লক্ষ মেট্রিক টন। চলতি অর্থবছরে খাদ্য শস্যের চাহিদা প্রাক্কলন করা হয় ২২৬.৮২ লক্ষ মেট্রিক টন। এ বছর কৃষি, মৎস্য ও পশু সম্পদ প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াবে যথাক্রমে ২.৪১, ৩.৬ ও ৪.৪৮ শতাংশ । বাংলাদেশের কৃষি ভরণপোষণ পর্যায়ে (Subsistence level) পরিচালিত হওয়ায় উপকরণ হিসাবে কৃষি ঋণ একটি ভিন্নমাত্রার গুরুত্ব বহন করে। **সরকার এ বছর ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণের সুদ মওকুফ ঘোষণা করেছে, যা কৃষকদের ঋণ ভার লাঘব করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সুদূরপ্রসারী অবদান রাখবে। এর ফলে ১৫ লক্ষ কৃষক ৫০০ কোটি টাকা সুদ পরিশোধের দায় থেকে মুক্তি পাবে।** কৃষির অগ্রগতির সাথে বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা, জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। একারণে কৃষি খাতের উন্নয়নে সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। দেশে বর্তমানে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং সেই সাথে খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার ও টেকসই করার লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তি-নির্ভর আধুনিক কৃষিব্যবস্থার উপর বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে দেশের সর্বত্র মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের দোরগোড়ায় সারসহ কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ, কৃষি সম্প্রসারণ নীতির বাস্তবায়ন, কৃষিঋণ বিতরণ পদ্ধতি সহজিকরণ, কৃষিখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি, কৃষিজাত পণ্যের মান উন্নয়নের জন্য গবেষণা পদ্ধতির আধুনিকায়ন, গবেষণালব্ধ সমন্বিত প্রযুক্তি ব্যবহার ও সম্প্রসারণ এবং মৎস্য ও পশু সম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা

হয়েছে। মাটির গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা গবেষণাগারের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মাঠ পর্যায়ে মাটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাটির উর্বরা শক্তি বজায় রাখার জন্য শস্য বহুমুখীকরণ কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে।

শিল্প (Manufacturing)ঃ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্নমুখী পদক্ষপ গ্রহণের ফলে সার্বিক বিনিয়াগ তথা অর্থনীতিতে অভূতপূর্ব গতিশীলতা সঞ্চারিত হয়েছে। ১৯৯২-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সময়ে শিল্প খাতের (ম্যানুফ্যাকচারিং) জিডিপিতে গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৮.২১ শতাংশ। কিন্তু ১৯৯৭ থেকে ২০০১ পর্যন্ত মোট পাঁচ অর্থবছরে এ খাতে গড় প্রবৃদ্ধি আশংকাজনক হারে ৫.৬৪ শতাংশে নেমে আসে। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে তা ৬.৬ শতাংশে উন্নীত হয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাম্প্রতিক গতিধারা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, চলতি অর্থবছরে (২০০৩-২০০৪) শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশে উন্নীত হতে পারে। এ উর্ধ্বমুখী প্রবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছ মূলতঃ বিনিয়াগ বোর্ড ও সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে। বর্তমানে বাংলাদেশে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়াগ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০২ সালে (জানু-ডিসেম্বর) বৈদেশিক বিনিয়াগ ছিল যেখানে ৩২৮.০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সেখানে ২০০৩ সালে (জানু-ডিসেম্বর) সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সেবা খাতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রস্তাব রয়েছে। বিগত দু'বছর আট মাসে ঋণপত্র ভিত্তিক মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানির মোট পরিমাণ ১১,৫৯৪ কোটি টাকা যা তৎপূর্ববতী ৫ বছরের মোট পরিমাণের চেয়ে ২৩.৪৯ শতাংশ বেশি। দেশের শিল্পায়ন ও আর্থিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা এবং শ্রমিকদের অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে সরকারের লোকসানি প্রতিষ্ঠানগুলোকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড (বর্তমান প্রাইভেটাইজেশন কমিশন) গঠন করা হয়। এ কমিশন গঠনের পর থেকে মার্চ ২০০৪ পর্যন্ত মোট ৫৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। তম্মধ্যে চলতি আর্থিক বছরের (২০০৩-২০০৪) ৩১শ মার্চ পর্যন্ত ১২ (বার) টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বেসরকারি মালিকানায় হস্তান্তার করা হয়েছে। সম্প্রতি আরও ৬টি প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারি মালিকানায় হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে মার্চ, ২০০৪ পর্যন্ত মোট চালুকৃত শিল্পের সংখ্যা ১৯৬টি এবং মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৭০৮.৮৬ মার্কিন ডলার। এ শিল্পগুলোতে মোট ১,৩৫,৯১৬ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পঃ বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ এযাবত অবহলিত ছিল। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ সব প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ব্যাংক ও অন্যান্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে এদের প্রবেশগম্যতা ছিল নগণ্য পর্যায়ের। এই শিল্পের বেশীরভাগ অর্থ নিজস্ব সঞ্চয় এবং পারিবারিক সঞ্চয় থেকে নির্বাহ করা হত।

বর্তমান সরকার দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং ব্যবসায়িক কর্মকান্ড সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ঋণ প্রদানের কার্যএ্রম হাত নিয়েছে। সম্প্রতি বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেশের উৎপাদন ও সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেকার যুবদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করছে। ২০০২-০৩ অর্থবছরে কর্মসংস্থান ব্যাংক ৯,৪৮৬ জন বেকার যুব ও শিল্প উদ্যোক্তার মধ্যে ০.২৮ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করছে এবং একই সময়ে ০.২৬ বিলিয়ন টাকা আদায় করছে। ২০০১-০২ অর্থ বছরে ৯,৫৪৬ জন শিল্প উদ্যোক্তার মধ্যে ০.২৮ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছিল। কিন্তু ঋণ অনাদায়ীর পরিমাণ ২০০১-০২ অর্থবছরের জুনের শেষে যেখানে ৮.৩ শতাংশ ছিল তা ২০০২-০৩ অর্থ বছরের একই সময়ে ২৫ শতাংশে দাঁড়ায়। ঋণ পরিশোধের মেয়াদ স্বল্পকালীন (২ বৎসর) হওয়ায় এই অনাদায়ি ঋণের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠার জন্য আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক ২০০২-০৩ অর্থবছরে ০.৮২ বিলিয়ন এবং ২০০১-০২ অর্থ বছরে ০.৬৭ বিলিয়ন টাকা আনসার ও গ্রাম-প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে ঋণ প্রদান করে। তাদের ঋণ অনাদায়ীর পরিমাণ ছিল ২.০৮ শতাংশ । বেসিক ব্যাংক ২০০৩ অর্থবছরে ৭.০৭ বিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করে এবং তাদের অনাদায়ি ঋণের

পরিমাণ ছিল ১০.৭ শতাংশ। এ সকল আর্থিক ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়াও অনেক সরকারি ও বে-সরকারি সংস্থা দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঋণ প্রদানে এগিয়ে এসেছে যেমন বিআরডিবি, যুব উন্নয়ন পরিদপ্তর, বার্ড ইত্যাদি।

দারিদ্র বিমাচন কৌশলের উপর গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে সম্প্রতি সরকার দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ঋণ বিতরণের পাশাপাশি তাদের ব্যবসায়িক কর্মকান্ড সম্প্রসারণের লক্ষ্যে **"স্মল এন্টারপ্রাইজ"** খাতে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাংলাদশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃ অর্থায়ণ সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১০০(একশত) কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে। এসব শ্রম নিবিড় শিল্পের প্রসারের ফলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, অপরদিকে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আয় ও ভোগক্ষমতা বাড়বে এবং মানব সম্পদের উন্নয়নসহ রপ্তানি বাজার তৈরি হবে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা

দেশে বর্তমানে মোট ৪৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্হা রয়েছে। এ সংস্থাসমূহ দেশের শিল্প, বিদ্যুৎ ও গ্যাস, পরিবহন,যাতায়াত এবং সেবা খাতে সক্রিয় থেকে জাতীয় উৎপাদন, মূল্যসংযোজন, কর্মসংস্থান ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ সকল সংস্থার পরিচালন রাজস্ব, মূল্য সংযোজন ও প্রবৃদ্ধির হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরের তুলনায় ২০০২-২০০৩ অর্থ বছর পরিচালন রাজস্ব ১১.৯১ শতাংশ বৃদ্ধিসহ ,মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ২,৩০৬ কোটি টাকা থেকে ৩,৬৬৮ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ১৬.৫৫ শতাংশে উন্নীত হয়। । ২০০২-০৩ অর্থবছর এ সকল সংস্থার নীট মুনাফা ছিল ৭৭.৫১ কোটি টাকা । ২০০৩-০৪ অর্থবছরে নীট লোকসান প্রাক্কলন করা হয়েছে ৮২৩.৬৭ কোটি টাকা । রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ২০০২-০৩ অর্থবছরে সরকারি কোষাগার ১৬৮.৫১ কোটি টাকা লভ্যাংশ প্রদান করে। চলতি অর্থবছর (২০০৩-০৪) এই লভ্যাংশের পরিমাণ ২৬৩.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০০২-০৩ অর্থবছর ১৪টি রাষ্ট্রীয় সংস্হাকে অনুদান/ভর্তুকি হিসেবে ৩৩১.৬৮ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এর পরিমাণ ৩৯১.০১ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় এ সংস্হাগুলোর নিকট থেকে দায়-দেনা (ডি,এস,এল) বাবদ ২০০২-০৩ অর্থবছরের ১,৬১৬.৪৩ কোটি টাকার বিপরীতে ১,১২৭.৬৫ কোটি টাকা আদায় করা হয়। চলতি অর্থবছরে এই পাওনার পরিমাণ ১,৪৮২.৩৬ কোটি টাকা হতে মে ২০০৪ পর্যন্ত ৯২৯.৬৩ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের প্রায় সমস্ত সম্পদ ও ঋণ সরকার অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে যোগান দেয়া হয়ে থাকে। এপ্রিল ২০০৪ পর্যন্ত এ সংস্থাগুলোর নিকট বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৮,০৬৫.১০ কোটি টাকা ঋণ রয়েছে। এর মধ্য খেলাপী ঋণের পরিমাণ ৯৩৬.৬৯ কোটি টাকা। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে মোট সম্পদের উপর পরিচালন মুনাফার হার প্রায় সকল বছরের জন্য ঋণাত্মক হলেও তা এনমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

সরকার আগামী ২০২০ সালের মধ্যে দেশের সকল জনসাধারণের জন্য বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতে প্রয়োজনীয় বিভিন্নমুখি ও বিভিন্ন মেয়াদি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বেসরকারিখাতে ১,২৯০ মেগাওয়াট স্থাপিত বিদ্যুৎ ক্ষমতাসহ মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৪,৭১০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। তন্মধ্যে নির্ভরযোগ্য উৎপাদন ক্ষমতা ৩,৭০০ মেগাওয়াট । সরকার সরকারি বিনিয়োগের পরিপূরক হিসেবে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য ব্যাপক উন্নয়ন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বর্তমানে মোট স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার ৭২.৬১ শতাংশ সরকারি খাতে এবং ২৭.৩৯ শতাংশ বেসরকারিখাতে। অপরদিকে নীট উৎপাদনের ৬৫.৮১ শতাংশ সরকারিখাতে এবং ৩৪.১৯ শতাংশ বেসরকারিখাতে উৎপাদিত হচ্ছে। নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৮৯.৩৯ শতাংশ গ্যাসভিত্তিক, ৪.৫২ শতাংশ পানিভিত্তিক এবং ৫.১৪ শতাংশ তেলভিত্তিক। বর্তমানে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৪৪ কিলোওয়াট আওয়ার এবং দেশের বিদ্যুৎ সুবিধাভোগীর সংখ্যা প্রায় ৩২ শতাংশ। বিদ্যুৎ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) অন্যতম প্রধান ভূমিকা রাখছে। বিউবো'র মালিকানধীন

পিজিসিবি বর্তমানে বিদ্যুৎখাতের সমগ্র সঞ্চালন ব্যবস্থার পরিচালন ও সংরক্ষণসহ ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের পূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়া বিতরণ ব্যবস্থাপনায় পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (ডেসা) এবং ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) প্রভৃতি কাজ করছে। বিউবো'র সিস্টেমে দেশে ৩৩ কিলোভোল্ট ও ১১ কিলোভোল্টে বিদ্যুৎ বিতরণ করা হয় এবং বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সারাদেশে ২৩০ কিলোভোল্ট ও ১৩২ কিলোভোল্টে সঞ্চালন করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা ৭০ ভাগ পূরণ করে থাকে। দেশে এ যাবৎ মোট ২২টি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। মোট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মধ্যে ২০০২-০৩ অর্থবছরে প্রকৃত গ্যাস উত্তোলিত হয়েছে ৪২১.১৬ বিলিয়ন ঘনফুট। গ্যাস সম্পদের দ্রুত অনুন্ধান ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সারা দেশকে ২৩টি ব্লকে বিভক্ত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১২টি ব্লকের জন্য উৎপাদন বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গ্যাসের বর্ধিত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারিখাতও এগিয়ে আসছে। পরিবেশ দূষণ রোধের জন্য যানবাহনসমূহকে সিএনজি'তে রূপান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ঢাকা 'ক্লিন ফুয়েল প্রজেক্ট'-এর আওতায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সিএনজি চালিত অটোরিক্সা এবং পেট্রোল চালিত কার সিএনজি'তে রূপান্তরের লক্ষ্যে ১০ হাজার রূপান্তর কিট আমদানির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন দেশের বিভিন্ন স্থানে জ্বালানি মজুদ ব্যবস্থা উন্নয়ন,সম্প্রসারণ ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্নকরণের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। অধিকতর ক্ষমতা ব্যবহারের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলার কোম্পানিগুলোকে প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছে।

যোগাযোগ ও পরিবহন

বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাফল্যের মূলে দক্ষ পরিবহন ও যোগাযাগ ব্যবস্থার অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ সড়ক, রেল, নৌ ও আকাশপথ এবং ডাক, টেলিযোগাযাগ ও তথ্য প্রযুক্তি সমন্বয়ে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। স্থিরমূল্যে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে জিডিপিতে এই খাতের অবদান প্রায় ৯.৮৬ শতাংশ (সাময়িক) যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের দিক থেকে অন্যান্য পরিবহন ব্যবস্থার তুলনায় সড়ক পরিবহনই সর্বাধিক ব্যবহৃত মাধ্যম। এই সুবিশাল সেক্টরের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। অন্যদিক সড়ক পরিবহনের রেগুলেটরি দায়িত্ব পালন করছে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি। রেলওয়ে পরিবেশ বান্ধব ও স্বল্পমূল্যের পরিবহন ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত অন্যতম বাহন। নৌ-বাণিজ্যে চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দর অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করে। এছাড়া মংলা সামুদ্রিক বন্দর, স্থল বন্দরসমূহ ও সরকারি-বেসরকারি এয়ারলাইন্স সমূহের ভূমিকাও উল্লখযাগ্য। আন্তর্জাতিক নৌ-পথে দক্ষ শিপিং সুবিধা প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন সরকারি মালিকানাধীন একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। নৌ-পরিবহন ও তার নাবিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর বিভিন্ন আইন প্রয়োগ করে রেগুলেটরি দায়িত্ব পালন করে থাকে। প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যের পরিধি বৃদ্ধি তথা চোরাচালান ও শুল্ক ফাঁকি রোধ কল্পে ১৩টি স্থানে স্থল বন্দর সমূহে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বহুবছর লোকসানী প্রতিষ্ঠান হিসেবে থাকলেও আকাশপথে চলাচলকারী বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ক্রমান্বয়ে তার মন্দাবস্থা কাটিয়ে উঠছে। বাংলাদেশ তার ও টেলিযোগাযোগ বোর্ড দ্রুত সম্প্রসারণশীল একটি সরকারি সংস্থা। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ সরকারের একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। প্রতিনিয়তই এটি নুতন নুতন সার্ভিস প্রবর্তন করছে। একবিংশ শতাব্দির চ্যালঞ্জ মোকাবিলায় তথ্য প্রযুক্তি খাতের অগ্রগতি অনস্বীকার্য যদিও বাংলা-দেশে এখনও প্রতি ১,০০০ জনে মাত্র ৩.৬ জন কম্পিউটার ব্যবহার করছে। এ খাতের উন্নয়নে ইতোমধ্যে বেশকিছু পদক্ষপ গ্রহণ করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে মানব সম্পদ উন্নয়ন। এ কারণে জাতিসংঘের মিলিনিয়াম ডেভলপমেন্ট গোলস্ (এমডিজি)-এ মানব কল্যাণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আমাদের দেশেও এমজিডি গোলস্কে সামনে রেখে মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। মানব সম্পদ উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার সামাজিক খাত সমূহে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে সম্পদ বৃদ্ধি করছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে কয়েকটি মন্ত্রণালয়ে সামাজিক খাতসমূহে বরাদ্দ রয়েছে মোট সরকারি ব্যয়ের ২৪ শতাংশ। শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৯৯০ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নারী শিক্ষার প্রসারে ছাত্রী উপবৃত্তি চালু করা হয়েছে। বয়স্ক ও নিরক্ষরদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এসব উদ্যোগের ফলে স্বাক্ষরতার হার বর্তমানে ৬২.৬৬ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষাক্রম পরিমার্জন, ভৌত অবকাঠামো সৃষ্টিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম চালু রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষার পাশাপাশি জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি কার্যকর ও সুষ্ঠু স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। জুলাই'০৩ থেকে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচি (HNPSP)-এর কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। নারী ও শিশুর উন্নয়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। নারী পুরুষের অসমতা দূরীকরণ ও নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। দেশের যুবসমাজকে উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তরে এবং উন্নয়নে যুব শক্তির সার্বিক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী বেকার যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, ঋণ সহায়তা প্রদান, উদ্বুদ্ধকরণ ও অনুদান প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশের ভূমিহীন, দুঃস্থ, ভবঘুরে, এতিম, প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম ও উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। ক্রীড়া ক্ষেত্রে এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড অব্যাহত রয়েছে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে মানব সম্পদ উন্নয়নে নিম্ন পর্যায় থেকে বাংলাদেশ প্রথমবারের মত শ্রীলংকা ও ভারতের ন্যায় মধ্যম পর্যায়ে স্থান করে নিয়েছে।

দারিদ্র বিমোচন

বিশ্বব্যাপী দারিদ্র একটি উৎকণ্ঠার বিষয়। একারণে জাতিসংঘ ঘোষিত মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস্ (এমডিজি) - এ ২০১৫ সালকে চরম দারিদ্র ও ক্ষুধা নির্মূলকরণের মাধ্যমে বিশ্বের জনসংখ্যার যে অংশ দৈনিক এক মার্কিন ডলার কম আয়ে জীবন-যাপন করছে এবং যে অংশ ক্ষুধা পীড়িত তাদের সংখ্যা অর্ধেকে কমিয়ে আনার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে এমডিজি'র লক্ষ্য অর্জনে এ অঞ্চলের দেশসমূহের তৎপরতা জোরদার করার আশু কর্তব্য নিয়ে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই। দারিদ্রের ব্যাপকতা ও গভীরতার কারণে সরকার এমডিজি'র সাথে সামঞ্জস্য রেখে দারিদ্র নিরসনকে অগ্রাধিকার প্রদান করছে। বাংলাদেশের দারিদ্র পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৯১-৯২ সালে উচ্চ দারিদ্র রেখা অনুসারে দারিদ্রের হার ছিল ৫৮.৮ শতাংশ। অন্যদিকে নিম্ন দারিদ্র রেখা অনুযায়ী এ হার দাঁড়িয়েছিল ৪১.৭ শতাংশ। ২০০০ সালে এ হার দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৯.৪ এবং ৩৩.৭ শতাংশ। এমডিজি-এর লক্ষ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের ১৯৯০-এর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেক নামিয়ে আনতে হলে বাংলাদেশের দারিদ্র হার ২৯.৪ শতাংশে কমিয়ে আনতে হবে। বর্তমান সরকার এ সম্পর্কে সচেতন। ২০০৩-০৪ অর্থবছরের বাজেটে দারিদ্র নিরসন কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কৃষি ও কৃষি বহির্ভূত খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন এবং পল্লী অঞ্চলে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যাকে অর্ধেক নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ একটি কার্যকর কৌশল। প্রাপ্ত তথ্যমতে সরকার এবং এনজিসমূহের যৌথ প্রয়াসে বাংলাদেশ ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে উল্লেখ্যযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। দেশের প্রধান নয়টি এনজিও ডিসেম্বর' ০৩ পর্যন্ত ২৩,৭৭৬.৭৯ কোটি টাকা বিতরণ করে। ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৯০ শতাংশের উপরে। পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন ২০০৪ সালের জানুয়ারী মাস

পর্যন্ত পিকেএসএফ তার ২১৬ টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৪৮,৯১,২৩২ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে ১,৬৯৮.৩৩ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ১৯৯০-৯১ হতে ২০০৩-০৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০০৩ পর্যন্ত ৪৬৫টি উপজেলায় ৬২,৯৫৯টি সমিতির অধীনে ১৭.২১ লক্ষ সদস্যকে ২,৯৪২.৫৭ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে যার বিপরীতে আদায় হয়েছে ২৪৯৭.৯৩ কোটি টাকা।

বেসরকারিখাত উন্নয়ন

মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বেসরকারিখাতকে উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। এ কারণে বর্তমান সরকার দেশের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমে বেসরকারিখাতের সম্পৃক্ততা আরো বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ উদ্দেশ্যে সরকার একদিকে যেমন বিনিয়োগ-বান্ধব (investment friendly) পরিবেশ উন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছে, অন্যদিকে টেকসই উন্নয়নে বেসরকারিখাতকে সম্পৃক্তকরণেরও উদ্যোগ নিয়েছে। বেসরকারিকরণ নীতিমালার সংশোধন, শিল্পনীতি সংস্কার, বিনিয়োগ বোর্ড গঠন, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন গঠন এবং মূলধন বাজারকে শক্তিশালীকরণ সরকারের গৃহীত বহুবিধ উদ্যোগের মধ্যে অন্যতম। পুঁজিঘন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বেসরকারি উদ্যোগকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ২০০২-০৩ অর্থবছরে বেসরকারিখাতে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১,২৯০ মেগাওয়াট-এ উন্নীত হয়েছে যা ২০০১-০২-এ ছিল ৮১০ মেগাওয়াট। বেসরকারিখাতের ১,২৯০ মেগাওয়াটসহ বর্তমানে দেশে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৪,৭১০ মেগাওয়াট। টেলিযোগাযোগ খাতেও বেসরকারি কোম্পানিসমূহ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। পরিবহনখাতে গৃহীত নানা উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে বিমান চলাচল, নৌ-পরিবহন ও রেলওয়ে খাতে বেসরকারিখাতের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। দেশের সড়ক নেটওয়ার্ক কাঠামোকে বেসরকারিখাত ভুক্তকরণের বিষয়ে সম্প্রতি খসড়া জাতীয় স্থল পরিবহন নীতিতে সবিশেষ গুরুতের সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে। পর্যটন শিল্পে বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিছু কিছু পর্যটন হোটেল, রেস্তোরাঁ ও বার ইত্যাদি বেসরকারি ব্যবস্থাপনা চুক্তিতে হস্তান্তর হয়েছে। বেসরকারিখাতে বর্তমানে ৩৮টি ব্যাংক, ৬০টি বীমা কোম্পানি ও ২৮টি অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলি সুষ্ঠু ও দক্ষ সেবা প্রদানের পাশাপাশি অন্যান্য বিনিয়োগকে সহজ ও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে সহায়তা করছে। ব্যাংকিং ব্যবস্থার সংস্কার কর্মসূচীর অংশ হিসাবে সরকার রূপালী ব্যাংককে ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর এবং বাকি তিনটি জাতীয়করণকৃত বানিজ্যিক ব্যাংকসমুহের ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহন করেছে। ২০০২ সাল পর্যন্ত বেসরকারিখাতে মোট ২৪,৭৩৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতে বর্তমানে ৮৮৬টি বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক চালু রয়েছে। বেসরকারিখাতে উচ্চশিক্ষা এবং বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হচ্ছে। কৃষিখাতে ব্যক্তি উদ্যোগে ব্যাপক কার্যক্রম চালু রয়েছে। অগভীর নলকূপ বিক্রয়, উন্নতমানের বীজ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বেসরকারিখাত বিশেষ অবদান রাখছে। একইভাবে পাট শিল্প ও বস্ত্র শিল্পখাতেও বেসরকারি উদ্যোগ বিশেষ অবদান রাখছে। সরকার গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে মোট বিনিয়োগ খাতের অবদান প্রায় ৭৪ শতাংশ অবদান রাখছে।

পরিবেশ ও উন্নয়ন

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পরিবেশ এবং উন্নয়ন অন্যতম প্রধান আলোচিত বিষয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে পরিবেশ নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। একারণে একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিমাপের ক্ষেত্রে পরিবেশ উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ চলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। জাতিসংঘের পরিসংখ্যান অফিস ১৯৯৩ সালে পরিবেশ বিষয়টি বিবেচনায় এনে System for Environment and Economic Accounts (SEEA) প্রণয়ন করেছে। এতে প্রচলিত জাতীয় আয় নিরূপণের তথ্যের সাথে পরিবেশগত তথ্য ও উপাত্তসমূহের সমন্বয়ের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। পরিবেশগত এ হিসাব নিরূপণে কোন কোন দেশ উদ্যোগ নিয়েছে। পরিবেশগত সমস্যা মোকাবেলায় সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সম্প্রতিক সময়ে

গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে পরিবেশ দূষণকারী পলিথিন সপিং ব্যাগ উৎপাদন, ব্যবহার ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধকরণ, বায়ুদূষণ রোধে লেডমুক্ত গ্যাসোলিন সরবরাহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, ঢাকা মহানগরীর বায়ুদূষণ রোধ ও বায়ুর গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে দুইষ্ট্রোক ইঞ্জিনবিশিষ্ট যানবাহন প্রত্যাহার, পেট্রোল ও ডিজেল চালিত যন্ত্রযানে ক্যাটালাইটিক কনভার্টার, অক্সিডেশন কাটালিষ্ট ডিজেল পার্টিকুলেট ফিল্টার সংযোজন বাধ্যতামূলক করা এবং একই সঙ্গে যন্ত্রযানে সিএনজি-এর ব্যাপক ব্যবহার চালু করা হয়েছে যা ঢাকা মহানগরীর বায়ুদূষণ রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া শিল্প কারখানায় সৃষ্ট দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং নদীসমূহকে দূষণমুক্ত করার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নেও সরকার বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করছে।

জাতীয় প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারকল্পে সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করা দরকার। এ জন্য প্রয়োজন গণসচেতনতা সৃষ্টি ও আইনগত বাধ্যবাধকতা। পরিবেশ সংরক্ষণে প্রণীত নীতিমালা/আইনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল- জাতীয় পরিবেশ নীতি, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ও বিধিমালা, পরিবেশ আদালত আইন, জাতীয় বন নীতি, জাতীয় পানি নীতি এবং জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ইত্যাদি পরিবেশ সংক্রান্ত প্রায় ২৮টি চুক্তি, কনভেনশন ও প্রটোকলে বাংলাদেশ অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ। দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা রক্ষায় সরকার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু, সমন্বিত ও পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে যথাযথ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে সরকার তা বাস্তবায়ন করছে। পাশাপশি পরিবেশ সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে স্বাক্ষরিত কনভেনশন, প্রটোকল ও চুক্তির অঙ্গীকার বাস্তবায়নেও সরকার কাজ করে যাচ্ছে।